মাদরাসা শিক্ষায় স্বীকৃতি

জিয়াউদ্দীন আহমেদ

| ঢাকা , রবিবার, ১৯ আগস্ট ২০১৮

ঢাকার কওমি মাদরাসাগুলোর নিয়ন্ত্রক বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া এবং কওমি মাদরাসার নিজস্ব বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড থেকে দাওরায়ে হাদিসের যে সনদ দেয়া হয় তাকে জেনারেল ধারার এমএ ইসলামিক স্টাডিজ, এমএ এরাবিকের সমমানের স্বীকৃতি প্রদানের ঘোষণা সরকারের তরফ থেকে ইতিপূর্বে দেয়া হলেও কয়েকদিন আগে এ সম্পর্কিত আইনের খসড়ায় নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। এ স্বীকৃতি প্রদানে সরকার প্রভাবিত হয়েছে সম্ভবত এ কারণে যে, দাওরায়ে হাদিস স্তরে কওমি মাদরাসার পাঠ্যসূচি গুণগত ও পরিমাণগত বিচারে বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত দুটি ধর্মীয় বিষয়ে অনুসৃত পাঠ্যসূচির সমমানের। কিন্তু কওমি শিক্ষা বা বিদ্যমান পাঠ্যসূচির সংস্কার না হলে কোন একটি সাবজেক্টের সমতুল্য সনদ পেয়ে চাকরির জন্য প্রার্থী হওয়ার ব্যাপক সুবিধা তাদের থাকবে বলে মনে হয় না। কোন কোন কওমি মাদরাসায় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা, অঙ্ক, ইংরেজি, সমাজ, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি পড়ানো হলেও এ জ্ঞান চাকরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য পর্যাপ্ত নয়। তবে ভোটের ক্ষেত্রে এরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রেসার

গ্রুপ বলে প্রাতযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের ধাঁচের পরিবর্তন হয়ে গেলে বা তাদের জন্য কোটা বরাদ্দ করা হলে সব লন্ডভন্ড হয়ে তাদের অনুকূলে চলে যাবে।

বাংলাদেশে দুই ধরনের মাদরাসা রয়েছে- আলিয়া ও কওমি। আলিয়া মাদরাসা কওমি মাদরাসা থেকে ভিন্নতর। আলিয়া মাদরাসার ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি থাকায় সেখানে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে পড়ানো সম্ভব হচ্ছে; কিন্তু কওমি মাদরাসায় সরকারের সামান্যতম নিয়ন্ত্রণও নেই। বাংলাদেশের কোথাও মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় তারা সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করে না। কওমি মাদরাসার শিক্ষা বোর্ডগুলোর ওপরও সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। সাধারণ শিক্ষার প্রতি তাদের ঘোরতর বিতৃষ্ণা লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ শিক্ষাকে প্রতিহত করার লক্ষ্য নিয়ে কওমি মাদরাসার আলেমেরা সরকার থেকে এতদিন দূরে ছিল। এই আলেমদের একটাই লক্ষ্য, ১৮৬৬ সনে ভারতে প্রতিষ্ঠিত দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসার অনুসারী কওমি মাদরাসার স্বকীয়তা ধরে রাখা। সরকার নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত ছিল বলে ব্রিটিশ আমলে এই মাদরাসাগুলোকে খারিজি মাদরাসাও বলা হতো। সরকারের সাম্প্রতিক এই স্বীকৃতিকে তাই কওমি মাদরাসার সবাই মনে প্রাণে মেনে নিতে পারছে না। তাদের অভিমত হচ্ছ, এ স্বীকৃতি মাদরাসাগুলোতে বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার একটি হাতিয়ার রূপে কাজ করবে। এছাড়া দ্বীনি শিক্ষায় ইহজাগতিক

কোন স্বীকৃতির আবশ্যকতা আছে বলেও তাদের অনেকে বিশ্বাস করে না। তাদের একটি অহংবোধ হচ্ছে, তারা চাকরির জন্য লেখাপড়া করে না; তারা লেখাপড়া করে দ্বীন শেখা ও আল্লাহকে পাওয়ার জন্য।

সরকারের অনুমোদনের তোয়াক্কা করা হয় না বলে বাংলাদেশের যত্রতত্র কওমি মাদরাসা গড়ে উঠছে। তাই কওমি মাদরাসা ও তাদের ছাত্রছাত্রীর সঠিক সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। একটা লেখা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে সারা দেশে বেফাকুল মাদারিসের নিবন্ধনভুক্ত কওমি মাদরাসার সংখ্যা ১৫ হাজার, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪০ লাখ, শিক্ষকের সংখ্যা দুই লাখ। এছাড়া স্বতন্ত্র কয়েকটি কওমি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আরও অনেকগুলো কওমি মাদরাসা রয়েছে। ‘বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষার রাজনৈতিক অর্থনীতি’ নামের গবেষণামূলক গ্রন্থটিতে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর একটি অনুসন্ধানমূলক তথ্যের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই বইটির মোড়ক উন্মোচনকালে বক্তারা যা বলেছেন তা হলো, বাংলাদেশে প্রতি তিনজন ছাত্রের মধ্যে একজন মাদরাসার ছাত্র। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী ২০০৮ সনে সারা দেশে মাদরাসার ছাত্র সংখ্যা ছিল এক কোটি এবং এর মধ্যে ৫২ শতাংশ কওমি মাদরাসার ছাত্র। তাদের দেয়া চিত্তাকর্ষক তথ্যটি হচ্ছে, মাদরাসা শিক্ষা পরিচালনা পর্ষদে যারা আছেন তাদের ৯২ শতাংশের সন্তানেরা মাদরাসায় পড়ে না এবং মাদরাসার ৯২ শতাংশ ছাত্র নিম্ন মধ্যবিত্ত

পারবারের। তারা আরও উল্লেখ করেছেন যে, মাদরাসায় শিক্ষিতদের ৭৫ শতাংশ বেকার। এই বেকার কওমি শিক্ষার্থীদের দিয়ে ইসলামী রাজ কায়েমে যে কোন পন্থা অবলম্বন সহজ, অর্থাৎ ধর্মের নামে এদের যে কোন কাজে সংগঠিত করা সম্ভব।

চাকরির জন্য প্রতিযোগিতায় সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে এদের বেশিরভাগ আরেকটি কওমি মাদরাসা খুলে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করছে। তাই কওমি মাদরাসার বিস্তৃতি অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ে দ্রুত গতিতে বাড়ছে। শহর ও গ্রামের আনাচে-কানাচে শুধু মাদরাসা নয় মহিলা ক্যাডেট মাদরাসার অগণিত সাইনবোর্ড পরিলক্ষিত হয়। এদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক নষ্ট রাজনীতির রাজনৈতিক কুশলীবেরা। এদেশের প্রতিটি নির্বাচনের পূর্বে অনেক প্রার্থী ধর্মের লেবাস পরে ভোট প্রার্থনা করে থাকে। আমার কর্ম জীবনেও আমি এমন লেবাসধারী বহু কর্মকর্তা-কর্মচারী দেখেছি। বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল সংগঠনের নির্বাচনের পূর্বে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নামাজের ওয়াক্তের সময় না হলেও সবাইকে নামাজ পড়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত করে তুলতো। পশ্চিম পাকিস্তানের এককালের প্রধান বিচারপতি কায়ানী আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে, ‘এজলাসে দাঁড়ানো চোর, ডাকাত, লম্পট সবার মাথায় টুপি দেখতাম, সৎ সাজার এ ভন্ডামি দেখে আমি মনে মনে হাসতাম’ (বহুদিন পূর্বে পড়া বলে হুবহু উদৃধতি দেয়া সম্ভব হয়নি)। আমাদের দেশে ভোট

এলে অবৈধ অর্থের মালিকেরা পরকালে বেহেস্ত আর ইহকালে ভোটের প্রত্যাশায় দুই হাতে মাদরাসায় দান করে থাকে। এদের কোথাও স্কুল, লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী মনে হয়নি।

সরকারও মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলে মনে হয় না। অবশ্য মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সরকার ইচ্ছে করলে অকস্মাৎ বন্ধ করতেও পারে না। বিষয়টি স্পর্শকাতর বলে সব গণতান্ত্রিক সরকার ভোটের প্রত্যাশায় চুপ থাকে। অন্যদিকে সরকারের স্কুল, কলেজের শিক্ষাব্যবস্থায় লেখাপড়া করতে ইচ্ছুক সব শিক্ষার্থীকে আওতাভুক্ত করার জন্য পর্যাপ্ত নয়; বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক শিক্ষা প্রদানে প্রয়োজনীয় সহায়ক সমর্থন দেয়া সরকারের পক্ষে এখনও সম্ভব হচ্ছে না বলে স্বাক্ষরতা গণনায় মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা অনুকূল বিবেচিত হচ্ছে। তাছাড়া এত কম খরচে শিক্ষা পাওয়ার আর কোন ব্যবস্থা না থাকায় গরিব ও নিঃস্ব অভিভাবকেরা এ শিক্ষায় আকৃষ্ট হচ্ছে। আমাদের ছোটকালে শোনা, পরিবারের কেউ ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মাওলানা হতে পারলে তার চৌদ্দ পুরুষ বেহেস্তে যাবে। সন্তানদের মাদরাসায় পাঠিয়ে জান্নাত লাভের এই সহজ পথ গরিব, দুস্থরা হারাতে চায় না। এমনও দেখা গেছে, যাদের দীর্ঘকাল সন্তান হয় না তারা সন্তানের প্রার্থনায় মাদরাসায় পড়ানোর মানত করে। যাদের সন্তান জন্মের পর পর মারা যায় তারা মাদরাসায় পড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে সন্তানের জীবন ভিক্ষা চায়। অনেকে এলাকায় প্রভাব-

প্রাতপাত্ত বাড়ানোর আভপ্রায়ে নিজের ছেলেটিকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে পাড়ার মসজিদের ইমাম করতে আগ্রহী হয়ে থাকেন। নিজেদের পাপ কাজের কাফফারা দেয়ার সুপ্ত বাসনা থেকেও অনেকে সন্তানকে হাফিজ বানানো বা মাদরাসায় পড়ানোর তাগিদ অনুভব করে থাকেন।

মাদরাসা শিক্ষার সমর্থকেরা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বস্তুগত ও বিজ্ঞান নির্ভর পড়াশোনার বিপক্ষে বলতে গিয়ে উল্লেখ করে যে, ঈমান আকিদা আমল বিবর্জিত এই শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ বিনষ্টকারী অনৈতিক শিক্ষা। এ নীতি বিবর্জিত শিক্ষার কারণে মাদক সেবন করছে যুবক সমাজ, অবক্ষয় হচ্ছে মূল্যবোধের, বাড়ছে ছাত্রদের টেন্ডারবাজি, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, ঘুষ, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, মাস্তানি। মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিতরা বস্তু জগতের বিভিন্ন অন্যায়-অবিচার, ঘুষ-দুর্নীতি, চুরি-ডাকাতি, মারামারি, খুনাখুনি, মাস্তানি, ধর্ষণ ইত্যাদির জন্য ধর্মের নৈতিকতা বিবর্জিত স্কুল-কলেজের শিক্ষাকে দায়ী করে থাকে। তাদের আক্ষেপ, পার্থিব জগতের লোভ-লালসায় মুসলমানেরাও আজকাল খোদাবিমুখ শিক্ষায় মনোনিবেশ করছে। তাদের কথা হচ্ছে ইহজাগতিক বা বস্তুগত শিক্ষায় নিমজ্জিত বলেই সারা পৃথিবীর মুসলমানদের অধপতন রোধ করা যাচ্ছে না; পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী শিক্ষার আধিপত্যে মুসলমানরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। তাই ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া

প্রভৃতি দেশে সশস্ত্র মুসলিম গ্রুপ স্কুল, কলেজে আক্রমণ করে থাকে। ইংরেজদের ইহজাগতিক ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের বিরুদ্ধাচারণে ভারতবর্ষে কওমি শিক্ষাধারার সূত্রপাত। কিছু মুসলমানের মানসিক গঠনে কোন পরিবর্তন ২০০ বছরে হয়নি। ফলে এই শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামি আদর্শভিত্তিক মুসলমান তৈরির ওপর গুরুত্ব দেয়ার প্রারম্ভিক রীতির কোন পরিবর্তন এখনও দেখা যায় না। যুগ যুগ ধরে একই পাঠ্যসূচিকে যুগোপযোগী করার যে কোন প্রস্তাবকে ইসলামি শিক্ষা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র বলে বাতিল করা হয়েছে। তাদের ধারণা এ সব প্রস্তাবের মাধ্যমে আত্মিক প্রশান্তি ও মানসিক পরিতৃপ্তি লাভের পথ রুদ্ধ করার অপপ্রয়াস চালানো হয়।

কওমিদের বিরোধী পক্ষ আবার এমন পরকালমুখী চিন্তা-ভাবনা ও শিক্ষাব্যবস্থা মুসলমানদের অধপতনের কারণ বলে অভিমত ব্যক্ত করে থাকে। তাদের যুক্তি হচ্ছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আল্লাহর নেয়ামত; তাই এগুলোর অধ্যায়নে আমাদের অনীহা জাগানোর এই অপচেষ্টা মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্যও এক সময় হুমকিস্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুটি মতকেই নিজেদের সুবিধামতো লালন করা হয়ে থাকে। সুবিধাভোগী বলে এক এক সরকারের আমলে এক এক মত গুরুত্ব পায় এবং এই কৌশলে উভয় মত শক্তি সঞ্চয় করতে করতে এক সময় দেশ ইসলামিক প্রজাতন্ত্রে উন্নীত হলে আশ্চর্য হবে না।

ধর্ম ছাড়াও একটি জাতির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠে শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে। পৃথিবীর বহু দেশের ভাষা ও ধর্ম এক, কিন্তু জাতি ভিন্ন। ধর্ম, ভাষা এক হলেও ভিন্নতর সংস্কৃতিই জাতির স্বকীয়তার একমাত্র পরিচায়ক। ইংরেজি মাধ্যমে যারা লেখাপড়া করছে তারাও সাহিত্য, সমাজ, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস সব পড়ছে। মাদরাসা শিক্ষার মাধ্যমে একই দেশের নাগরিকদের মধ্যে ভিন্নতর শিক্ষার কারণে আচার-আচরণ, কথা-বার্তা, চিন্তা-চেতনা, পোশাক-পরিচ্ছদসহ সার্বিক জীবনবোধে পার্থক্য তৈরি হচ্ছে। অনেক মাদরাসায় জাতীয় দিবসগুলোও পালন করা হয় না। সরকারও স্পর্শকাতর এ সব বিষয়ে চাপ সৃষ্টি করে ভোট হারাতে চায় না।

সংবাদ পত্রিকার সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘সরকারের তরফ থেকে যখন ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে, সমাজের সর্বস্তরের আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক ও মানসম্মত শিক্ষা সম্প্রসারণের কথা জোরেশোরে প্রচার করা হচ্ছে তখন আমরা দেখছি, শুধু ভোটকে কেন্দ্র করে জনগণের ট্যাক্সের টাকায় যত্রতত্র মাদরাসা নির্মাণের মহোৎসব চলছে’। বস্তুগত শিক্ষার অভাবেই সম্ভবত ইহুদি-নাসারাদের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার মতো বুদ্ধি ও ক্ষমতা মুসলমানদের থাকছে না। তাই ‘সংবাদ’-এর আরেকটি সম্পাদকীয় কলামে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, সরকারের এ স্বীকৃতি প্রদানের

সিদ্ধান্ত অনৈতিক, অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য বিধায় তা বাতিলযোগ্য।

[লেখক : বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক ও সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক]

zeauddinahmed@gmail.com